আচার্য্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অভিভাষণ

২

শিক্ষার বিকিরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩

আচার্য্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অভিভাষণ

২

শিক্ষার বিকিরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিষে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েচে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েচে কত জনকে সেই হিসাবেই ভোজের মর্য্যাদা। আমরা যে-এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আছে কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধূ ধূ করচে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েচে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তাহলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পটজোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক ভূমিকাভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ কেবল অভ্যাস বশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েচে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখিনে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভর্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার

প্রতিরূপ ছুটো একটা দেখা দিচ্চে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজজুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্ত-বিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্য-যুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চ্চা টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিস্-এর সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্ম্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সর্ব্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্ব্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েচে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্ত্তকর্ম্ম ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন

স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্ব্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েচে, রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেচে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্ব্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্ম্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষীরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলচে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা,—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারি সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝঙ্কার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজো আমার মনে আছে। কথাটা এই—যাত্রী প্রবেশ করতে চলেচে বৃন্দাবনে, পাহারা-ওয়ালা আটক করলে তার পথ, বললে, তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না। যাত্রী বললে, সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল।

দ্বারী বললে, ঐ যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেচ নিজেরই জিম্মায়। এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগলো, দুপর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনচে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্চে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেচে দেশে, বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেচে ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েচে, মানুষের যে-শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেচে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়েচে অল্পদিন হোলো। আমাদের দেশে যে-জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না, তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে যেমন রক্ত-চলাচল হয় সর্ব্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্ত্তন হোলো। ইতিমধ্যে শিক্ষিত সমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখন বা করুণকণ্ঠে কখন বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এলো পাঁকের কাছে নেমে, এদিকে সহরে সহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, এ'কেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎরূপ সেটা লুকোলো আমাদের অগোচরে, যে-প্রাণ যে-আলো দেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হোলো ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ সহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেচে আনু-ষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত।

কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

সহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হোলো এন্‌লাইটেন্‌ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেইদিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো রোগ বলো অজ্ঞান বলো জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হোলো সুজলা সুফলা টানাপাখাশীতলা, সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয়নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। এ'কে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এ রকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্দ্ধেক আলোয় অর্দ্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্পকালের, কিন্তু

সেখানে সেটা তালিদেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিত্তার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েচেন পূর্ব্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেচে। কিন্তু তার চেয়ে সর্ব্বনেশে ক্ষতি হয়েচে জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলা দেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে—হাল আমলের অনাদরে এবং নির্ব্বুদ্ধিতায় সে সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে ব'লেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেচে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠচে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্ব্ব সঞ্চয় কিছু বাকি আছে তাই এখনো দেখতে পাচ্চিনে এর মার মূর্ত্তি।

মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্য্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেচেন তাঁরা দেখেচেন সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এককালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে-দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে-রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়চে না, কেননা বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েচি, গবাক্ষ-লণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলা দেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েচে নেমে, তীরের মাটি গিয়েচে

ফেটে, বেরিয়ে পড়েচে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করচে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহু দূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনচে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্ত্তনের কোনো একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হোত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে

হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে সহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল অন্যদিকে আধুনিককালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হোলো তারো প্রবাহ বইল না সর্ব্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ

ভর্ত্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজূটের মধ্যে বিশেষভাবে, তবুও দেব-ললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্ত্য-জনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েচেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্র্যাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েচে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি

সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্য্যন্ত হোলো না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে, শ্বশুর বাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটা গেল কোথায় ?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েচে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পূরোপূরি বহন করে আনচে না। যে-বিদ্যা বর্ত্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করচে, উদ্‌ঘাটন করচে বিশ্ব-রহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে-মন, যে-মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব্ব-যুগান্তরে, আর যে-মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেচে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিকটাতে যে-দিকে চলেচে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েচে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো

আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্ত্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল-বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে-বা পোকায় ছিদ্র করেচে, কোনো বৎসর-বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেচে আপন স্বাস্থ্য আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান করে রেখেচে তার বিদ্যা তার শিক্ষা তার সাহিত্য সমস্ত মিলে, তার কর্ম্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েচে এই সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার, অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের, বলি এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক

সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু-সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চ্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েচে। তাতে ধর্ম্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেচি এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে সহর পর্য্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষ-নাশী ধর্ম্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এ জন্যে অন্তত বাঙালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে এ'কে নিন্দা করা সহজ কিন্তু কী করলে এ'কে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ওদিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা হোক কোনো একটা আস্বাদন পায়। আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারী পর্য্যন্ত পৌঁছতে

পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায়নি অন্তত তারা আনাড়ি-পাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে-বিদ্যা মননের, সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করচে প্রত্যহ, পণ্যের আদানপ্রদান চলচে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দ্দিন এসেচে চারদিক থেকে ঘন ঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্ম্মে পেয়েচে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েচে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েচে, পেয়েচে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সঙ্কুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এলো।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্দ্ধে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা

জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য সকলকে খর্ব্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দুমুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করচে তার মূলেও আছে সর্ব্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েচে, আত্মীয়কে তুলচে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করচে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্ব্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্য্যন্ত আজ এগোলো যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েচে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও এক-রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক

হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর ক'রে হট্টগোল যতই পাকানো যাক সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না, তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্ব্বত্র সুগম হয়েচে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব, বন্ধু যে আজ দুর্লভ হোলো। তাই বাংলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করচি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্ব্বদেহে। প্রশ্ন এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে

পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করচে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষ্যে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখিনে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলা ভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষনীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃ-ভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালী যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিত সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে। এমনো এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর

ছাত্রেরা বাংলা জানিনে বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েচে। সেদিন আজ আর নেই বটে কিন্তু বাঙালীর ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে সাড়ি পরালে প্রেষ্টিজ হানি হোত। শিক্ষাসরস্বতীকে সাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে সাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েচি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেচেন ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া

পেয়েচে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপূর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলচি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী।

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্চি—তোমার অভ্রভেদী শিখর চূড়া বেষ্টন ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে,

মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠক আনন্দধ্বনি।